ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ*

[সারসংক্ষেপ : *মানব পাচার একটি জঘন্যতম অপরাধ ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি এমন এক সহিংসতা যা সভ্যতা, মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকারের প্রতি উপহাস এবং বর্বরতার প্রতিচ্ছবি। মূল্যবোধের অবক্ষয়, আইনগত দুর্বলতার সুযোগ, নীতি ও অনুশাসনের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, দুর্বলতা ও শিক্ষার অভাব এবং তা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কমতি এবং সর্বোপরি প্রতিকারের জন্য আইনি সহায়তার সীমিত সুযোগ মানব পাচারের কারণগুলোর অন্যতম। বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও মানব পাচারের বিষয়টি ব্যাপক আলোচনায় ছিলো না। তবে সাম্প্রতিক মানব পাচার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তা প্রতিরোধ ও দমনের কৌশল আলোচনায় তাৎপর্য পায়। বাংলাদেশে অতিসম্প্রতি এ বিষয়ক আইন প্রণীত হলেও মানব পাচার সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা অবনতি অতীব আলোচিত বিষয় হিসেবে গোচরে আসে। মানব পাচার যেমন আইন-শৃঙ্খলার অবনতির উল্লেখযোগ্য সূচক, তা রোধ করা তেমনি নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্বের অংশবিশেষও বটে। আলোচ্য প্রবন্ধে মানব পাচাররোধে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুপারিশমালা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

মানব পাচার একটি জাতীয় সমস্যা, যা মানবীয় মর্যাদার প্রতি এক চরম আঘাত। মানব পাচারে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। তবে সম্প্রতি মানব পাচার নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। বিশ্বব্যাপী এ মুহূর্তে যে সমস্যা মারাত্মকরূপ ধারণ করেছে তা হচ্ছে মানব পাচার। বাংলাদেশের অদক্ষ জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সমাজে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতার বহুমাত্রিক হেতু, পেশা ও কর্মের অবাধ সুবিধাহীনতা, বেশি বেতনে চাকরির প্রলোভন ও উন্নত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, মাদক ও যৌন ব্যবসা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সম্প্রতি মানব পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মানব পাচার রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও ঘোষণা রয়েছে। মানব পাচার যে কারণেই হোক এটি নৈতিকতা, আইন ও ধর্ম কর্তৃক অসমর্থিত। ইসলাম মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার নিরাপত্তা প্রদান করেছে। ইসলামের পরিবার ব্যবস্থাও একটি আশ্রয় দুর্গ।

পাচারের সংজ্ঞা ও কারণ

পাচার শব্দের অর্থ গোপনে অপসারণ, চুপি চুপি সরিয়ে ফেলা, চুরি করে নিঃশেষকরণ, সাবাড়, খতম, শেষ।[১] পাচার বলতে দেশের ভেতরে অথবা দেশের সীমানার বাইরে বিক্রয়, বিনিময় বা অন্য কোন অবৈধ কাজে নিয়োগের জন্য নারী, শিশু বা কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করাকে বুঝায়। মানুষ নিয়ে ব্যবসা ও মুনাফাকারীরা শিশু, নারী বা কোন ব্যক্তিকে ফুসলিয়ে, অপহরণ করে, অবরুদ্ধ করে যে অবৈধ কাজ করে তাকেই পাচার বলে।[২] এছাড়া কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করে বা প্রতারণা করে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে বা আর্থিক লেন-দেনের মাধ্যমে দেশের বাইরে বিক্রি করাকেও মানব পাচার বুঝায়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৯৪ সালের অনুষ্ঠিত এক সভায় পাচার বলতে বুঝানো হয়েছে:

> Trafficking in human beings is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.[৩]
>
> অর্থাৎ মানব পাচার হচ্ছে, ভয় দেখিয়ে বা জোর করে অথবা অন্য কোনও ভাবে জুলুম করে, হরণ করে, প্রতারণা করে, ছলনা করে, মিথ্যাচার করে, ভুল বুঝিয়ে,

১. বাংলা একাডেমী, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৩৮৭

২. এ্যাডভোকেট সালমা আলী, *নারী ও শিশু পাচার, বিদ্যমান আইন এবং সুপারিশ*, উন্নয়ন পদক্ষেপ, দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ-২০০৬, পৃ. ৪৪-৪৫; আফরিনা বিনতে আশরাফ, *নারী ও শিশু পাচার রোধ*, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১০ম বর্ষ, বত্রিশতম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ৩৭

৩. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children which supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly in its resolution 55/25 (A/RES/55/25)

ক্ষমতার অপব্যবহার করে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অথবা যার উপরে একজনের কর্তৃত্ব আছে অর্থ বা সুযোগ-সুবিধার লেনদেনের মাধ্যমে তার সম্মতি আদায় করে -শোষণ করার উদ্দেশ্যে কাউকে সংগ্রহ করা, স্থানান্তরিত করা, হাতবদল করা, আটকে রাখা বা নেওয়া।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

'মানব পাচার' অর্থ কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করিয়া; বা প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগাইয়া; বা অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।[৪]

বাংলাদেশে মানব পাচার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মানব পাচারের বিভিন্ন পথ রয়েছে। মানব পাচার বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। নারী ও শিশু পাচারকারী অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসার সঙ্গে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দলও নিয়োজিত রয়েছে। দেশের মধ্যেও গ্রাম থেকে শহরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে, একই শহরে নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে অন্য এক জায়গায় পাচার করা হয়। উন্নয়নশীল ও দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল দেশসমূহের জাতীয় সীমানার বাইরে পাচারকারী ও অপরাধীচক্র মুনাফার জন্য নারী ও শিশুদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং জোরপূর্বক অর্থনৈতিক ও যৌন উৎপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে পাচার করে থাকে। মানব পাচারের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরাই পাচারের প্রধান বলি। নারীদের পাচার করার উদ্দেশ্য মূলত তাদেরকে দেহব্যবসায়ে কাজে লাগানো; ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্মে নিয়োজিত করা, পানশালায় নাচানো, অশ্লীল ছবি, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করানো। এছাড়া সস্তা শ্রমের জন্য ব্যবহার করা, নেশার দ্রব্য পাচার করানো, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা, ভিনদেশী পুরুষদের যৌনলালসা মেটানোর জন্য বিয়ের নামে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে পাচারের উদ্দেশ্য হল- সস্তা শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার, যৌন শোষণের জন্য বিক্রি করা। এছাড়া নেশার দ্রব্য পাচার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি ইত্যাদির জন্য শিশুদের পাচার করা হয়।[৫]

৪. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩ (১)

৫. *Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, 2011. p. 2; Trafficking in Human Beings' by INTERPOL. Available in full text on http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking. Accessed on 27.05.15.

বাংলাদেশ থেকে সাধারণত যশোর, সাতক্ষীরা, বেনাপোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দর্শনা, দিনাজপুর, লালমনিরহাট সীমান্ত ও স্থলবন্দর এলাকা দিয়ে নারী ও শিশু পাচার হয়। তবে এর মধ্যে যশোর ও সাতক্ষীরা শিশু পাচারের প্রধান পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৬] সম্প্রতি টেকনাফ অঞ্চলের রোহিঙ্গা শরণার্থী নারী ও শিশু, পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নারী ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মানুষদের মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় পাচারের জন্য জলপথও ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইউএনডিপির তথ্য মতে এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সী প্রায় তিন লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। আর তিন দশকে পাচার হয়েছে দশ লাখ।[৭] বিভিন্ন মানবাধিকার, নারী ও শিশুকল্যাণ সংগঠনের গবেষণা প্রতিবেদনেও এর সত্যতা মিলে। সবচেয়ে বেশি পাচারের শিকার হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলার বাসিন্দারা। তবে সম্প্রতি সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দাদের ভাল চাকরির আশ্বাস দিয়েও পাচার করা হচ্ছে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশন ইউএনএইচসিআর'র বিবৃতিতে বলা হয়, ঝুঁকি সত্ত্বেও অনেক মানুষ এই বিপদসঙ্কুল পথ ব্যবহার করে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন। যার ফলে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজারের মতো বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা মানব পাচারের শিকার হয়েছে। এ সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তিনগুণ।

সাগর পথে বেঁচে যাওয়া অভিবাসীদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাসে অনাহার, পানিশূন্যতা এবং পাচারকারীদের নির্যাতনে আনুমানিক ৩০০ জন মানুষ সমুদ্রে মারা গেছে। জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে পাচার হয় প্রায় ৫৩ হাজার মানুষ; যার পরিমাণ আগের বছর ছিল ৩৩ হাজার। ইউএনএইচসিআর-এর মুখপাত্র এ্যাড্রিয়ান এডওয়ার্ডস জানান, মানব পাচার করা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ফলে শিশুদেরও অপহরণ এবং জোর করে মানব পাচারের উদ্দেশ্যে নৌকায় তোলা হয়। ইউএনএইচসিআর রিপোর্টে আরো বলা হয়, ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১.৫০ লাখ মানুষ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়েছে।[৮] এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের

৬. Ms. Amrita Biswas, Human Trafficking Scenario in Bangladesh: Some Concerns, *International Journal of Humanities & Social Science Studies* (IJHSSS), Assam: Scholar Publications, 2015, Volume-I, Issue-IV, PP. 87-88

৭. ইউএনডিপি রিপোর্ট ও দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে, ২০১৫

৮. ইউএনএইচসিআর রিপোর্ট, এপ্রিল,২০১৫; দৈনিক প্রথম আলো, ৯ মে, ২০১৫

দাবি- বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ১০-১৫ হাজার মানুষ পাচার হচ্ছে।[৯] রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৪ সালে পাচারের সময় বাংলাদেশীদের মধ্যে ৫৪০ জন গভীর সমুদ্র পথে মারা যায় এবং নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই।[১০]

বাংলাদেশে মানব পাচার নিরোধমূলক আইন

বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার নিরোধমূলক পরিপূর্ণ ও সরাসরি কোনো আইন ছিল না। তবে ২০০০ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০'-এর কয়েকটি ধারায় নারী ও শিশু পাচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এ আইনের পঞ্চম ধারায় নারী[১১] ও ষষ্ঠ ধারায় শিশু পাচারের শাস্তি[১২] বর্ণিত হয়েছে। ফলে এতো দিন নারী ও শিশু পাচার অপরাধের বিচার উক্ত আইনের দু'টি ধারার মাধ্যমে সমাধান করা হতো যা অপর্যাপ্ত। ২০০৩-এ এই আইনের কিছুটা সংশোধনী দেয়া হয়। এই আইনে বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের মধ্যে পাচারকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং পাচারকার্যে নিয়োজিতদের শাস্তি দেয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২" শিরোনামে এ বিষয়ক চূড়ান্ত আইন প্রণয়ন করেন। আইনটিতে চারটি অধ্যায় ও কয়েকটি ধারা বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন, সংজ্ঞা, মানব পাচার, আইনের প্রাধান্য এবং ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্যতা, অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ, মানব পাচার ও এতদসংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড, মানব পাচার নিষিদ্ধকরণ ও দণ্ড, সংঘবদ্ধ মানব পাচার অপরাধের দণ্ড, অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চালানোর দণ্ড, জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করতে বাধ্য করার দণ্ড, মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করার দণ্ড, পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নের জন্য আমদানী বা স্থানান্তরের দণ্ড, পতিতালয় পরিচালনা বা কোন স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের দণ্ড, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানোর দণ্ড, ভিকটিম বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদানের দণ্ড, মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের দণ্ড, অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা, অভিযোগ দায়ের এবং তদন্ত, অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে আইনগত অনুমান ও তদন্ত, প্রতিরোধমূলক তল্লাশী এবং আটক, মানব পাচার

৯. দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে, ২০১৫
১০. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মে, ২০১৫
১১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা ৫ (১)
১২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা ৬ (১)

অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং অপরাধের বিচার, মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন, ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা, ট্রাইব্যুনালের অধিকতর তদন্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা, রুদ্ধ-কক্ষ বিচার, দোভাষী নিয়োগ, সম্পত্তি আটক, অবরুদ্ধকরণ ও বাজেয়াপ্তকরণ এবং অতিরাষ্ট্রিক নিষেধাজ্ঞা, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ, বিদেশী দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা, ইলেকট্রনিক তথ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা, আপিল, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং সাক্ষীদেরকে সহায়তা এবং তাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে বা ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার, ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবাসন, ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে তথ্য সরবরাহ, আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা বিধান, পুনর্বাসন এবং সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ, ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান, শিশু ভিকটিম এবং শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা, ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করিবার অধিকার, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা, মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন, সমতার নীতির প্রয়োগ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিধান এবং বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ইত্যাদি আলোচনা পরিধিভুক্ত হয়েছে। নিম্নে আইনটির উপর একটি সারনির্যাস তুলে ধরা হলো:

আইনের উদ্দেশ্য: মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২'-নামে আইন প্রণয়ন করেছে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যেহেতু মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান করা আবশ্যক; এবং যেহেতু মানব পাচার সংক্রান্ত সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত আন্তঃদেশীয় অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও দমনকল্পে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।[১৩] এ আইনে অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৪] সংঘবদ্ধ মানব পাচারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা

১৩. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১৪. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৬ (২)

হয়েছে।[১৫] এছাড়া এ অপরাধে প্ররোচনা দিলে অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[১৬]

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা : আইন অনুযায়ী পাচার বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি উদ্ধার হওয়ার পর তাকে নিজের পরিবারে ফেরত পাঠানো না হলে বা তা সম্ভব না হলে প্রতিষ্ঠিত বা সরকার অনুমোদিত আশ্রয়কেন্দ্র/পুনর্বাসনকেন্দ্রে পাঠাতে হবে। তবে পাচারের শিকার ব্যক্তি আশ্রয়কেন্দ্রে বেশি দিন অবস্থান করতে পারবেন না। তারা চিকিৎসা, আইনি ও মানসিক পরামর্শ সেবা পাবেন।[১৭] পাচারের শিকার ব্যক্তি নিজে বা সাক্ষী যেন এ আইন বা অন্য আইনের অধীনে শাস্তি না পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। সাক্ষীকে হুমকি দিলে অনধিক ৭ বছর, অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা হবে।[১৮] পাচার হওয়া ব্যক্তি বা তার পরিবারের কারও নাম-পরিচয় বা ছবি প্রচার করা যাবে না। লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৯] এ ছাড়া পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী শিশু হলে 'শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ' নীতি প্রয়োগ করতে হবে।[২০]

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল : অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য সরকার দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলায় বিশেষ মানব পাচার দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সরকার প্রত্যেক জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে সেই জেলার মানব পাচার দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারবে। ট্রাইব্যুনালের অধীনে দায়রা আদালতের সব ক্ষমতা থাকবে। বিশেষ করে ট্রাইব্যুনাল 'ন্যায় বিচারের স্বার্থে' কোনো সুরক্ষামূলক আদেশসহ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের অধীনে বা ব্যবস্থাপনায় থাকা দলিল বা কাগজপত্র উত্থাপন করার নির্দেশ দিতে পারবে।[২১] ট্রাইব্যুনাল কোনো অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার সময় ওই আদেশের সঙ্গে তার নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিনে জামিন পাওয়া ব্যক্তিকে পুলিশ বা ট্রাইব্যুনালের কাছে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশনা দিতে পারবে।

অপরাধের আইনি প্রকৃতি: এ আইনের আওতায় অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপসযোগ্য হবে।[২২] কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী এ

১৫. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৭
১৬. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৮ (১)
১৭. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৬ (১-২)
১৮. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১৪
১৯. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৭ (২)
২০. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৮ (১)
২১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২২ (১)
২২. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১৬

আইনে অভিযুক্ত হলে মামলা দায়েরের জন্য সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করা হোক বা না হোক ট্রাইব্যুনাল ওই অপরাধ আমলে নিতে পারবে।

বিচার সম্পন্নের সময়সীমা: এ আইনের আওতায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকাজ সম্পন্ন করবে।[২৩] ন্যায়বিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধের বিচার কাজ কেবল মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং তাদের নিযুক্ত আইনজীবী বা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠানের আদেশ দিতে পারবে। ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনে দোভাষীও নিয়োগ দিতে পারবে।[২৪]

যৌথ আইনি সহায়তা ও বিদেশে পরোয়ানা: মানব পাচারের সঙ্গে যদি অন্য কোনো দেশের সংশ্লিষ্টতা থাকে বা ওই দেশে কোনো সাক্ষী, অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ, বিবাদী বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি থাকে, তবে সেই দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করা যাবে।[২৫] তবে চুক্তি সই না হওয়া পর্যন্ত এমন যৌথ আইনি সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারবে। এ ছাড়া বিদেশে বসবাসরত কোনো বিবাদীর বিরুদ্ধে এ আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানের অতিরিক্ত হিসেবে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ৯৩ক, ৯৩খ এবং ৯৩গ ধারায় প্রক্রিয়া যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রয়োগ হবে।

পতিতাবৃত্তির শাস্তি: কোনো ব্যক্তি কাউকে জোরজবরদস্তি করে বা লোভ দেখিয়ে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণের কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে আনলে অথবা দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠালে তার অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হবে।[২৬] এ ছাড়া কেউ পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করলে অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২৭]

বেশ্যাবৃত্তির আহ্বানও দণ্ডনীয়: কোনো ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে, ঘরের ভেতরে বা বাইরে কাউকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা অশালীন ভাবভঙ্গি দেখিয়ে আহ্বান করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২৮]

২৩. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২৪ (১)
২৪. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২৫,২৬
২৫. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৪১(১)
২৬. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১১
২৭. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১২ (১)
২৮. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১৩

সম্পত্তি আটক ও ক্ষতিপূরণ: বিচার চলার সময় অপরাধীর সম্পত্তি আটকের আদেশ দিতে পারবে ট্রাইব্যুনাল। এ আইনে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাইব্যুনাল তার দেশে-বিদেশে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে জমা হবে। এ ছাড়া কোনো অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাইব্যুনাল তদন্ত করে জরিমানার অতিরিক্ত হিসেবে পাচারের শিকার ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যও অপরাধীকে আদেশ দিতে পারবে।[২৯]

পাচারকারীর শাস্তি: মানব পাচারে জড়িত থাকার বিভিন্ন পর্যায় তথা পাচার, সংঘবদ্ধ পাচার, প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র, জবরদস্তিমূলক বা দাসত্বমূলক শ্রমে বাধ্য করা, পতিতাবৃত্তিতে বা যৌন শোষণের উদ্দশ্যে ইত্যাদি বিবেচনায় শাস্তিরও বহুমাত্রিকতা আইনে বর্ণিত হয়েছে। সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিভিন্ন পরিমাণে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।[৩০] এ ছাড়া আইনের অধীন অপরাধগুলো আমলযোগ্য, অ-আপসযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য।

সরকারের করণীয়: সরকার পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও উদ্ধার করে এ আইনের অধীনে কাজ করবে। সরকার এ জন্য বেসরকারি সংস্থার সহায়তাও নেবে। কেউ বিদেশে পাচার হলে সরকার বাংলাদেশ দূতাবাস এবং পররাষ্ট্র কিংবা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তাকে ফেরত আনার উদ্যোগ নেবে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি সরকার, পুলিশ বা বিশেষ তদন্ত ইউনিটের কাছ থেকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং মামলার সর্বশেষ অবস্থার ব্যাপারে মাসে অন্তত একবার অবগত হওয়ার অধিকারী হবে।

আশ্রয়কেন্দ্র ও পুনর্বাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা: পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক সেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সারা দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র বা পুনর্বাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে। এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরকারের লাইসেন্স নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবেন।[৩১]

প্রতিরোধ তহবিল: এ আইনের লক্ষ্য পূরণে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলও গঠন করা হবে।[৩২]

২৯. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২৭ (১,৩)
৩০. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৬-৯
৩১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৫ (১-২)
৩২. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৪২ (১)

মানব পাচার প্রতিরোধে ইসলাম

মানব পাচারের কারণ দেশ-কাল, পাত্র ও সমাজভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। ফলে এর প্রতিরোধের উপায়ও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশে মানব পাচারের জন্য যে সব কারণ দায়ী সে সব কার্যকারণ সমাজ থেকে উৎপাটনে ইসলাম যে সকল বিধি-বিধান উপস্থাপন করেছে সেগুলো হলো:

এক. ইসলামের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অন্যায়ভাবে কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তেক্ষেপ করবে না ও হত্যা-নিপীড়ন করবে না। মানুষকে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজন, যা মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত। এর বিভিন্ন দিক হলো:

ক. জীবনের নিরাপত্তা: পৃথিবীতে মানুষের সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম দিয়েছে পূর্ণ গ্যারান্টি। এতে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে চমৎকার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনও করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعاً﴾

নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কারণ ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করল।[৩৩]

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً﴾

আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত এবং তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।[৩৪]

সমাজে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যেন তাদের সন্তানদের হত্যা না করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মাজীদে কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেব।[৩৫]

৩৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩২
৩৪. আল-কুরআন, ৪ : ৯৩
৩৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

বিষয়টি সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ এবং সূরা আন'আমের ১৪০ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবরা তাদের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে সামাজিকভাবে অবমাননাকর কাজ বলে মনে করত। যার জন্য পিতা-মাতা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি আদরের সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[৩৬]

ইসলাম কন্যা সন্তান হত্যার জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বরং কন্যাদের লালন-পালনের ব্যাপারে আরও উৎসাহ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করল; তাদের উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং বিবাহ দিল; এবং তাদের প্রতি উত্তমাচরণ করল, সে জান্নাতে যাবে।[৩৭]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

যার দু'টি মেয়ে বা দু'টি বোন রয়েছে। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি এবং আমি জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকবো। একথা বলে তিনি তার তর্জনী এবং মধ্যমা আঙুল দেখালেন।[৩৮]

ইসলাম সকল সামাজিক কুপ্রথাকে পদদলিত করে কন্যাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানে অভিষিক্ত করেছে। ইসলাম কেবল অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যা নিষিদ্ধ করেনি; বরং আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ করছে। আত্মহত্যা সম্পূর্ণ অমানবিক ও অপ্রত্যাশিত, যা কুরআনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

৩৬. আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

৩৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশয়াস ইবন ইসহাক আল-সিজিসতানী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আবওয়াব আন-নাওম, পরিচ্ছেদ: ফী ফাযলে মান' আলা ইয়াতিমান, সিরিয়া: দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং ৫১৪৭, পৃ. ১৩৯৩; হাদীসটির সনদ যঈফ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-৫১৪৭

৩৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ*, অধ্যায় : আল-আদব, পরিচ্ছেদ : আল-'আতফ আলা আল-বানাত, বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৩ হি. হাদীস নং, ২৪৮৫০, খ. ৮, পৃ. ৩৬১; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১০২৬

﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।[৩৯]

এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে অনুরূপভাবে নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে অনুরূপভাবে বর্শা বিঁধতে থাকবে।[৪০]

মানব ইতিহাসে হত্যার সূচনা হয় আদম আ.-এর পুত্র কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এ হত্যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে:

﴿ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ﴾

তুমি যদি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, আমি কিন্তু আমার হাত তোমার দিকে তোমাকে হত্যা করার জন্য প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।[৪১]

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে পৃথিবীতে সংঘটিত সকল হত্যার একটি অংশ কাবীল পাবে।[৪২]

ইসলাম একটি শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।[৪৩]

৩৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

৪০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : বাবু মা যাআ ফী কাতলি আন-নাফস, বৈরুত : দারু ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি., হাদীস নং ১২৯৯, পৃ. ৩৮৪

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ২৮

৪২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : কাওলুল্লাহ ওয়া মান আহইয়াহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১০৮, পৃ. ৯৮৪
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليْه و سلم " :لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৪৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আল-মুসলিম মান সালিমা আল-মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০৮, পৃ. ৬

তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অপরিহার্য কর্তব্য এবং ঈমানি দায়িত্ব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও সহিংসতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে; মানবতাবিরোধী সব ধরনের অন্যায় হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত, অরাজকতা ও অপকর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে; সৎ কর্মে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে এবং জুলুম-নির্যাতনমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা এবং অর্থনৈতিক দর্শন ও অপরাধ দমন কৌশল ইসলামকে দিয়েছে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা। কিন্তু শান্তির ধারক-বাহক জনগণের বিরুদ্ধে সর্বদাই অশান্তিকামী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তরা খড়্গহস্ত থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন না।[৪৪]

অতএব, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে মানব পাচার বহুলাংশে কমে আসবে।

খ. সম্পদের নিরাপত্তা: রাসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের পূর্বে সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ছিল না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস সর্বত্রই বিরাজ ছিল। তিনি সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। তিনি বলেন:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ

যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ হবে।[৪৫]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

যদি কোন ব্যক্তি জবরদস্তি করে এক বিঘত জমি দখল করে তা হলে রোজ কিয়ামতে সাত স্তর জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[৪৬]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন:

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

৪৪. আল-কুরআন, ৫ : ৬৪

৪৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদ : মান কাতালা দূনা মালিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৪৮০, পৃ. ৭১৭

৪৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদ : মান যালামা শাইআন মিন আল-আরদি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯৭৭, পৃ. ৯৪২

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। **আর জেনে বুঝে** কোন মানুষের ধন, মালের কিয়দংশ অন্যায়ভাবেভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকের নিকট ঠেলে ফেলে দিওনা।[৪৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন তোমরা আমানতসমূহ তার যোগ্য ও পাওনাদার ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।[৪৮]

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক উপায় হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হচ্ছে: ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء منكُمْ ﴾ "যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।"[৪৯] সুতরাং ইসলাম সম্পদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে।

গ. মর্যাদার নিরাপত্তা: ইসলামে সমাজের ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলিম-অমুসলিম সর্বস্তরের মানুষের যথেষ্ট মান-সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার বিধান রয়েছে। কোনো অবস্থায় কাউকে অবমাননা করা চলবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُم﴾

তোমাদের কোনো সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে।[৫০]

মানুষের জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،

তোমাদের জান-মাল, ইয্যত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হল। তোমাদের আজকের এই পবিত্র দিন, এই পবিত্র (যিলহজ্জ) মাস, এই শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র।[৫১]

৪৭. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮

৪৮. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

৪৯. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৫০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১

৫১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, পরিচ্ছেদ : আল-খুতবা আইয়্যামি মিনাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬২৯, পৃ. ৪৯৮

ঘ. বাসস্থানের নিরাপত্তা: ইসলাম বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করেছে। কারণ সকলে যেন তার নিজ নিজ গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- فَإِن لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[৫২]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। আর প্রয়োজন শেষে খোশ-গল্পের জন্য বসে না থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আধুনিক সমাজে এমনকি মুসলিম সমাজেও কোন মেহমান বা আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে প্রবেশ করে বিনা প্রয়োজনে অযথা সময় নষ্ট করে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয়, যা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগূল হয়ে পড় না।'[৫৩]

তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহে বা পাশে অবস্থান করা যাবে এবং লেন-দেনও করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب﴾

নবী সহধর্মিনীগণের নিকট থেকে কোন বস্তু গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও।[৫৪]

৫২. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৮
৫৩. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৩
৫৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৩

একইভাবে কারো গৃহে উঁকি-ঝুঁকি মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম স. বলেন,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ

কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরে ঘরের বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত উঁকি মেরে তাকায়, তাহলে তার চোখ ফুটো করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হবে।[৫৫]

দুই. ইসলামের দণ্ডবিধি প্রয়োগ

ইসলাম অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন ধরনের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেছে, যার ফলে সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, হত্যা, ধর্ষন ইত্যাদি দূরীভূত হবে। এর বিভিন্ন দিক হলো:

ক. জীবনহানী নিষিদ্ধ: প্রাণ রক্ষার স্বার্থেই ইসলামে প্রাণদণ্ডের বিধান। হত্যাকারী যদি নিশ্চিত হয় যে, মানুষ হত্যার শাস্তি হিসেবে তার প্রাণপাত ঘটবে না তাহলে সে মানুষ হত্যা তার রুটিন কাজে পরিণত করবে, হয়তো সামান্য স্বার্থের জন্যও মানুষ হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ঘোষণা:

﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ﴾

আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৫৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

কিসাস বা বিচারিক প্রাণদণ্ডের মধ্যেই (সমগ্র মানবের) প্রকৃত প্রাণ নিহিত, হে বোধশক্তিসম্পন্নরা, যাতে তোমরা সাবধান হও।[৫৭]

আরও বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

আর আমি এতে তাদের ওপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। এরপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালেম।[৫৮]

৫৫. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদাব, পরিচ্ছেদ : তাহরিমি আন-নাযর ফী বাইতি গাইরিহি, বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ৪০২৩, পৃ. ১৫০৪
৫৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩
৫৭. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯
৫৮. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫

আয়াতদ্বয়ে কিসাস তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান ও নিহত-পক্ষের অধিকারের প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য সূরা ও আয়াতে এবং হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, হত্যা বা প্রাণহরণের প্রতিকার হলো অনুরূপ প্রাণদণ্ড প্রদান।

ইসলামের এ কিসাস বিধানে অমানবিক কিছু নেই; আছে সর্বাধিক মানবিকতা ও নিরেট বিশ্বমানবতার রক্ষাকবচ; যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অযাচিত রহমত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কুরআনের ভাষায়,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং তাকে সুন্দরভাবে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৫৯]

রাসূলুল্লাহ স. বিনা কারণে মানুষ হত্যাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ অর্থাৎ জঘন্যতম অপরাধসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৬০] তিনি মারামারি ও সশস্ত্র ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কেননা তাতে অকারণ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবহত্যা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। এ সম্পর্কে নবী করীম স. বলেন, দুই জন মুসলিম তরবারি (মারণাস্ত্র) সহ পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে পড়লে (একজন নিহত হলে), হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হবে। নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলে করীম স. বললেন, إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِه কেননা সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে উদ্যোগী ছিল। (অন্য জনের নিহত হওয়া তো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার। তার পরিবর্তে তারই হাতে সেও নিহত হতে পারত।)[৬১]

৫৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮

৬০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: দিয়াত, পরিচ্ছেদ: মান আহয়াহা .., হা. নং: ৬৪৭৭
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور

৬১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিতান, পরিচ্ছেদ : ইযা ইলতাকা আল-মুসলিমানি বি সাইফিহিমা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১, পৃ. ১৩

খ. অশ্লীলতা: মানব সমাজকে পূতঃপবিত্র এবং বিশৃংখলামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামে সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।[৬২]

আল্লাহ তা'আলা সকল ধরনের অশ্লীলতা পরিহারের নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৬৩]

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতিসমূহ অশ্লীল কাজ সম্পাদন করে তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দিত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না।[৬৪]

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে মন্দ কাজ থেকে কেবল দূরে থাকতে আদেশই প্রদান করেননি; বরং এসব অশ্লীল কাজ থেকে জাতিকে দূরে রাখতে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশও প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, নির্দেশ করবে সৎ কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম।[৬৫]

৬২. আল-কুরআন, ৭ : ৩৩

৬৩. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৬৪. আল-কুরআন, ৭ : ২৮

৬৫. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

অন্যত্র এ কাজকে মুমিনদের পারস্পরিক দায়িত্ব আখ্যা দিয়ে বলেন,

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৬৬]

আর এ ভিন্ন বা উল্টো চরিত্রকে মুনাফিকদের কর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এ সম্পর্কে বলেন,

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, এরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অপরের মতোই। তারা পরস্পরকে অসৎকর্মের আদেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে।[৬৭]

কোন নারীকে কটু কথা বলা, খারাপ ইশারা-ইঙ্গিত করা, হয়রানি করা, গালি দেয়া, ঢিল মারা, পথ রুদ্ধ করা যেমন অশ্লীল কাজ, তেমনি কোন নারী-পুরুষের বিকৃত স্থির ছবি বা নগ্ন ভিডিও ধারণ ও ছড়িয়ে দেয়া কিংবা প্রত্যক্ষ করা অশ্লীল কাজ। রাসূলুল্লাহ স. সবধরনের অশ্লীল কাজকে নিষেধ করে বলেন,

إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার প্রসার কোনটির ইসলামে ন্যূনতমও স্থান নেই। নিশ্চয়ই ইসলামে সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে যার স্বভাব-চরিত্র সবার চাইতে সুন্দর।[৬৮]

খ. ১. ব্যভিচার নিষিদ্ধ: ইসলাম অশ্লীল কাজ হিসেবে ব্যভিচারকে নিষেধ করেছে এবং এ অপরাধকে সব অপরাধের চেয়ে গুরুতর হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। এ অপরাধের শাস্তি অন্য অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোর করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾

ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।[৬৯]

৬৬. আল-কুরআন, ৯ : ৭১
৬৭. আল-কুরআন, ৯ : ৬৭
৬৮. আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশিশরীনা বিল জান্নাহ, অনুচ্ছেদ : আউয়ালু মুসনাদিল বাসরিয়্যিন, বৈরূত : দারু ইহইয়া আল-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ২০৪৩৫, পৃ. ৫২১৩; শু'আইব আল-আরনাউত হাদীসটির সনদটিকে সহীহ লি-গায়রিহী বলেছেন।
৬৯. আল-কুরআন, ২৪ : ২

ব্যভিচার সংক্রান্ত যত ধরনের পাপ কাজ সংঘটিত হয় সব লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

তোমরা দু'টি জিনিস তথা মুখ ও লজ্জা স্থানের দায়িত্ব নাও, আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিব।[৭০]

আল্লাহ তা'আলা লজ্জাস্থান হিফাজতকারীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী; আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৭১]

তাই আল্লাহ তা'আলা শুধু ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ আরও বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।[৭২]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .....وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ،

সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (সেই সাত শ্রেণীর একজন) যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় আর ঐ ব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।[৭৩]

সুতরাং পর্নোগ্রাফি ছবি বা অশ্লীল সিনেমা দেখাও ব্যভিচারের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

৭০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-রিকাক, পরিচ্ছেদ : হিফযিল লিসান, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৬৪৭৪, পৃ. ১৯৮২
৭১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৫
৭২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২
৭৩. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-যাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযল ইখফাইস সাদাকাহ, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১০৩৩, পৃ. ৬৪৮

প্রত্যেক আদম সন্তানের যিনার একটি অংশ রয়েছে। চোখ দু'টি যিনা করে, চোখের যিনা দেখা। দুই হাত যিনা করে, হাতের যিনা ধরা। দুই পা যিনা করে, পায়ের যিনা হাঁটা বা চলা। মুখও যিনা করে, মুখের যিনা চুমা দেয়া। অন্তর ইচ্ছা করে এবং আশা করে। যৌনাঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে কিংবা বিরত রাখে।[৭৪]

চোখের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জন্য দেখা অবৈধ এমন নারীর সৌন্দর্য ও রূপ উপভোগ করে। পরবর্তীতে এরূপ কাজের প্রতি অন্তরে ভাবের সৃষ্টি হয়। আর এ পথ ধরেই শুরু হয় অশ্লীলতা।

খ. ২. পতিতাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা নিষিদ্ধঃ ইসলাম ব্যভিচার, দেহব্যবসা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনীকে নিষিদ্ধ করেছে। নারী পাচারের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ অপরাধীদের উদ্দেশ্য থাকে পাচারকৃত নারীকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া। ইসলামে পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ হারাম এবং কোনো নারীকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা আরও বেশি অপরাধের শামিল। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের আশায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৭৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾

আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও খারাপ পথ।[৭৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছাকাছি যেয়ো না।[৭৭]

---

৭৪. আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুল 'আশারাহ আল-মুবাশিশরীনা বিল জান্নাহ, মুসনাদু আবি হুরাইরা রা., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৮৩২১, পৃ. ২০৯২; আবূল ফারয আব্দুর রহমান ইবন আবিল হাসান আত-তাইমী (ইবনুল জাওযী), *যাম্মু আল-হাওয়া*, অধ্যায় : যাম্মু আল-হাওয়া, পরিচ্ছেদ : আল-বাবুল খামিসু ওয়াল 'ইসরুন ফি যাম্মিয যিনা, বৈরূত : আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৯৯, হাদীস নং ৫৪৯, পৃ. ১৫৫; হাদীসটি বিভিন্ন সনদে একাধিক হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিছু শব্দের পরিবর্তন ও কমবেশি ছাড়া প্রায় সকল সনদই গ্রহণযোগ্য। দ্র. ইমাম আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ৩৭, হাদীস নং- ২৩৭০

৭৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

৭৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৭৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

অতএব ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোনো স্থান নেই এবং নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারেরও কোনো বিধান নেই। বরং এ সবই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আর উপার্জনের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো-পতিতাবৃত্তি। অর্থাৎ ঐ উপার্জন যা সে ব্যভিচারের মাধ্যমে তথা দেহ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ স. কুকুর বিক্রিত মূল্য, পতিতা ও গণকের উপার্জন হারাম করেছেন।[৭৮]

আবূ জুহায়ফা রা. সূত্রে বর্ণিত, 'আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিঙ্গা লাগানেওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّه نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

রাসূল স. রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী, সুদখোর ও সুদ-দাতার উপর এবং (জীবের) ছবি অঙ্কনকারীর উপর লানত করেছেন।[৭৯]

অতএব, যারা দেহ ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে তাদের এ নিকৃষ্ট উপার্জন সম্পূর্ণভাবে হারাম। সুতরাং দেহ ব্যবসা বন্ধ হলে মানব পাচার অনেকাংশেই কমে আসবে।

গ. অঙ্গহানি নিষিদ্ধঃ ইসলাম সৃষ্টির মৌলিকতার মাঝে কোনরূপ পরিবর্তনকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। পবিত্র কুরআন এ কাজকে শয়তানের পরামর্শ বলে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা শয়তানের এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾

আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।[৮০]

---

৭৮. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমু ছুমুনি আল-কালব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং. ১৫৬৭, পৃ. ১০৯০

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّه نَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

৭৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', পরিচ্ছেদ : ছুমুনি আল-কালব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৯৬, পৃ. ৬৩৮

৮০. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

ইসলাম মানবদেহের কোনরূপ বিকৃতি ঘটানোকে অমানবিক ও গর্হিত কর্মরূপে চিহ্নিত করেছে। রাসূলুল্লাহ স. মুসলিমদেরকে যুদ্ধকালীন সীমালঙ্ঘন, অসদাচরণ, লুটতরাজ, মহিলাদের ইয্যত-সম্ভ্রম নষ্ট করা, অহেতুক কোন কষ্ট দেয়া ও আহতদের অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. জিহাদে সেনাপতি নিযুক্ত করে তাকওয়া অবলম্বন, সদ্ব্যবহার, খেয়ানত না করা, ধোঁকা না দেয়া, অঙ্গচ্ছেদন না করা, শিশু হত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন।[৮১]

আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ স. লুটতরাজ এবং অঙ্গচ্ছেদ নিষেধ করেছেন।'[৮২] এছাড়াও নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত ব্যক্তিদেরকে হত্যা, সন্ন্যাসী, নির্জনবাসী ও সন্ধি-প্রিয়দের সাথে বিরোধ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৮৩] ইসলাম যুদ্ধে শত্রুর মৃত্যু পরবর্তী কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। এ বিধানকে 'মুছলা' বা অঙ্গ বিকৃতিকরণ বলা হয়। মুছলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। ইসলামী শরী'আহ্য় যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন উভয় সময়ে উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিতে নিদের্শ দেয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টিজগতের মাঝে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ 'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।'[৮৪] এ কারণে ইসলামী শরী'আহ মানুষের কোনরূপ অঙ্গ বিকৃতি অনুমোদন করে

৮১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আবওয়াবু আদ-দিয়াত আর-রাসূলুল্লাহ স., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১৪০৮, পৃ. ৫৪০; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৪০৮;

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليْه و سلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّة نَفْسه بتَقْوَى اللَّه، وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلمينَ خَيْرًا، فَقَالَ: " اغْزُوا بِسْمِ اللَّه، وَفِي سَبِيلِ اللَّه، قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا "

৮২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাযালিম, অনুচ্ছেদ : আন-নুহবা বি গাইরি ইযনি সাহিবী, হাদীস নং ২৪৭৪, পৃ.৭১৫

عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النهبة والمثلة

৮৩. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশয়াস ইবন ইসহাক আল-সিজিসতানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জিহাদ, পরিচ্ছেদ : দুআয়ি আল-মুশরিকীন, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৬১৪, পৃ.৭১৪; হাদীসটির সনদ যঈফ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-২৬১৪

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالك، أَنّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليْه و سلم قَالَ: " انْطَلقُوا باسْمِ اللَّه وَباللَّه وَعَلَى ملَّة رَسُول اللَّه، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانيًا وَلَا طفْلًا وَلَا صَغيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائمَكُمْ وَأَصْلحُوا وَأَحْسنُوا إنّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ

৮৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

না। এমনকি ইসলামে পুরুষ ও নারী সবাই মৌলিক মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত। সুতরাং ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে অঙ্গহানীর মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা থেকে বিরত থাকলে মানব পাচার লাঘব হবে।

তিন. ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও সুবিচার

সামাজিকভাবে মানুষ সম্মান-মর্যদার অধিকারী। কেউ কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারে না। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের তাকিদ দেয়। আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল হলো সামাজিকভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা এর অভাবে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকজন কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনের জন্য অবদান রেখেও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ফলস্বরূপ তাদেরকে উদাসীন হতে হয় এবং তাদের উদ্যোগ, আন্তরিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতা সবকিছু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮৫] সমাজে বসবাসরত মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। আল্লাহর বাণী,

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের (এগুলো) মেনে চলার উপদেশ দেন, যাতে তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। [৮৬]

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের কয়েকটি দিক হলো:

ক. শিশুশ্রম নিষিদ্ধ: ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া-স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।[৮৭]

৮৫. ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, ড. মাহমুদ আহমদ অনূদিত (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-বিআইআইটি, ২০০০), পৃ. ৯০

৮৬. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৮৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়া আল-সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ, পরিচ্ছেদ : মা যাআ আন রাহমাতি আল-সিবয়ান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯১৯, পৃ. ৭২৩; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৯১৯

শিশুরাই হলো দুনিয়ার সৌন্দর্য। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বা শিশুরা দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।[৮৮]

নারীদের মতো শিশুশ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম মজুরি দিয়ে কাজ করানো যায়। এ কারণেই নিয়োগকারীরা শিশুদের কাজে লাগায় এবং বেশি করে খাটায়, যা শিশুদের দেহ-মনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،

তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠোরতা আরোপ করো না।[৮৯]

ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে শিশুর যথার্থ বিকাশ সাধিত হয় না। রাসূলুল্লাহ স. অবহেলিত শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ধর্মে-কর্মে যথার্থ মানুষ হিসেবে গঠন করেছিলেন। তিনি শিশুদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। যে কোনো শিশুকে তিনি নিজের সন্তানের মতো আদর করতেন। তাই শিশুদের শারীরিক নির্যাতন না করে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা অত্যাবশ্যক। রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণীতে শিশুর সুন্দর নাম, সুখাদ্য, সুচিকিৎসা ইত্যাদির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুন্দর নাম তার মর্যাদার প্রতীক, স্নেহ তার সম্মানের প্রতীক এবং সুখাদ্য তার সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। সুতরাং একটি শিশুর বেড়ে ওঠা ও বিকশিত হওয়ার এসব উপাদানকে শিশুর অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি সন্তান ও তার মায়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ও তার ঘনিষ্ঠ জনদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।[৯০]

ইসলামের বিধান অনুযায়ী, প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। ইসলামের শ্রমনীতিমালা অনুসারে কাউকে তার সামর্থের বাইরে দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন নয়। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

৮৮. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৮৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদব, পরিচ্ছেদ : কাওলি আল-নাবী ইয়াসসিরু ওয়ালা তুআসসিরু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৭৩, পৃ. ১৮৭৭

৯০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সির আন রাসূলিল্লাহ, পরিচ্ছেদ : কারাহিয়্যাহ আল-তাফরীক আন আল-সাবী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৫৬৬, পৃ. ৬০৭; হাদীসটির সনদ হাসান; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৫৬৬;

﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত।[৯১]

কুরআনের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসের শিক্ষা প্রয়োগে মানব পাচার রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

খ. দাস প্রথার প্রতি নিরোৎসাহিত করণ : ইসলাম পরিকল্পিত উপায়ে দাস প্রথার প্রতি নিরোৎসাহিত করেছে, যাতে তা ক্রমান্বয়ে অবলুপ্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে দাসদের প্রতি ভদ্রজনোচিত ও সুবিচারভিত্তিক ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছে। দাসদের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে এই শিক্ষাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট বিধান। কেননা মানুষ একবার যখন মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তারা এর দাবি ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আর ভীত হয় না। দাসদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের মানবীয় মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধার পর্যায়ে মুসলিম জাতির ইতিহাস চরম বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তে ভরপুর। মদীনায় আগমনের পর বিশ্বনবী স. মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন তাতে করে তিনি আরব প্রভুদেরকে আযাদকৃত দাসদের ভাই বানিয়ে দেন। বিলাল ইবনে রাবাহকে ইবনু আবী রুওয়াইহার, যায়িদকে [যিনি স্বয়ং বিশ্বনবী স.-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন] হামজার এবং খারিজা ইবনু যায়দ রহ. কে আবু বকরের ভাই বানিয়ে দেন। ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। কেননা যাদেরকে একে অন্যের ভাই বানিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে একে অন্যের উত্তরাধিকার বলেও গণ্য করা হলো।

ইসলাম দাসদেরকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং জাতীয় অধিনায়কত্বের পদও প্রদান করেছে। বিশ্বনবী স. যখন আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন তখন তাঁর সিপাহসালার (Commander in Chief) নিয়োগ করেন তাঁরই দাস যায়িদ রা.-কে। যায়িদের ইন্তিকালের পর তিনি এই দায়িত্বভার তারই পুত্র উসামা রা.-এর হস্তে অর্পণ করেন। অথচ এই সেনাবাহিনীতে আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর ন্যায় মহাসম্মানীয় ও সর্বজনমান্য আরব নেতৃবৃন্দও বর্তমান ছিলেন- যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় সুবিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন। এরূপে বিশ্বনবী স. দাসদেরকে শুধু স্বাধীন মানুষের মর্যাদাই প্রদান করেননি, বরং স্বাধীন সৈন্যদের সুউচ্চ নেতৃত্বের পদও অলংকৃত করার সুযোগ দিয়েছেন। উমর রা. যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা পদে লোক নির্বাচিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন বলেন: আবূ হুযাইফা রহ.-এর মাওলা (আযাদকৃত

৯১. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬

গোলাম) সালিম এবং আবূ 'উবায়দাহ রহ. এ দুই ব্যক্তির একজন যদি আমার পর বেঁচে থাকে, তবে আমি এ দায়িত্ব তাকেই দিতাম।[৯২]

এতে করে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রথম পর্যায়ে দাসদেরকে কেবল মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক দিক থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্যে তাদের সাথে উদার ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করেছে। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদার সঠিক চেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অন্তরে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দাসদের এই মানসিক প্রশিক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করা এবং স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ের সর্বাত্মক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এরূপে তারা যখন স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ততা অর্জন করে ঠিক তখনই ইসলাম বাস্তব ক্ষেত্রেও তাদেরকে আযাদ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। কেননা ঐ সময়েই তারা স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠে এবং তা রক্ষা করার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা দাসমুক্তিকে হত্যাকাণ্ড হতে মুক্তির মাধ্যম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

এটা কোনো মু'মিনের কাজ নয় যে, সে আরেকজন মু'মিনকে হত্যা করবে। অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে তা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুমিন ক্রীতদাস (مُؤْمِنَة رَقَبَة) মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপুরি দুই মাস সাওম রাখবে। আল্লাহ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[৯৩]

সুতরাং পবিত্র কুরআনের বাণী ও সুন্নাহর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ডান হাতের অধিকারভুক্তদের সাথে তাদের অভিভাবকদের সম্পর্কটাকে অনেক আগেই জাহেলি যুগের দাসত্ব ও প্রভুত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বন্ধুসুলভ অভিভাবকত্বের পর্যায়ে উন্নিত করার পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলে দাস প্রথার মাধ্যমে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে। সমাজে এ শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে মানব পাচার প্রতিরোধ সম্ভব।

চার. ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো পরিবার। পরিবার ছাড়া মানুষ সত্যিকার অর্থে বাঁচতে পারেনা। পরিবারে মানুষ আশ্রয় পায়, একে অপরকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে। পরিবার প্রধান পুরো পরিবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরিবারের সকলের মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্ধন থাকে। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির কয়েকটি দিক নিম্নরূপ:

ক. পরিবার একটি আশ্রয় দুর্গ: ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা একটি সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায়। পরিবারের সদস্যদের সতর্ক প্রহরায় প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গরূপ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সর্বপ্রকার অযত্ন, অবহেলা, অযাচিত হস্তক্ষেপ, অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলে। পরিবার ছাড়া জীবনের যাত্রাপথে কোন নিরাপত্তা থাকে না। সামাজিক, মানবিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে মানুষ পরিবারেই সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়ে থাকে। পরিবার ছাড়া একটি শিশু নিরাপদ আশ্রয় পায় না। জীবনের শেষ পর্যায়ে যে মানবিক সেবা ও সহানুভূতি মানুষের দরকার তা পরিবারের বাইরে অন্য কোথাও ততটুকু পাওয়া যায় না। পিতৃ-মাতৃহীন এবং নিঃসন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে পরিবার। অসুস্থ, বিকলাঙ্গরা পরিবারে আশ্রয় পায়। পবিত্র কুরআনের নারীগণকে 'মুহসানাত' বলা হয়েছে। 'মুহসানাত' শব্দটির শব্দমূল 'হিসন' যার শাব্দিক অর্থ **দুর্গ**।[৯৪] পরিবারেই নারী সর্বাধিক নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে পরিবার নামক দুর্গে মানব সন্তানকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করা গেলে মানব পাচার কমে আসবে।

খ. দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্ক: ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। কারো দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামে

---

৯২. আবূ আব্দুল্লাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতু আল-রিসালাহ, ১৪০৬ হি., পৃ. ৩৭

عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وعنده ابن عمر، وسعيد بن زيد: " اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلَالَةِ شَيْئًا فى حديثه الطويل ..... ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ، ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ، لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

৯৩. আল-কুরআন, ৪ : ৯২

৯৪. ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, বৈরূত: দারু সাদির, খ. ১৩, পৃ. ১১৯

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশু জন্ম হলে তার প্রতি পিতা-মাতার করণীয় সব কিছু নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামে পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবারের পরিসর আরও ব্যাপক। নিকটাত্মীয়স্বজনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, দয়া, করুণা এবং সহানুভূতি তো আছেই, বাড়তি দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও জড়িত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনের ওপর নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি; স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চললে পারিবারিক পরিবেশ অনেকাংশে সুখ ও শান্তিতে ভরে ওঠে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হল মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। এ জন্য পরিবার গড়ার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে।

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৯৫]

গ. শ্রদ্ধা ও স্নেহ-মমতা: পারিবারিক জীবনে বড়দের শ্রদ্ধা করা ও ছোটদের স্নেহ করা অতীব গুরত্বপূর্ণ বিষয়। যে পরিবারে বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ দেখায় না সে পরিবারে শান্তি বিরাজ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়কে শ্রদ্ধা করে না সে আমার উম্মত নয়।[৯৬]

৯৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : অসিয়াত, পরিচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহি তা'আলা মিন বা'দি ওয়াসিয়্যাতি ইয়ূসি বিহা আও দাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৬৪, পৃ. ৭৩৭

৯৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়া আল-সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ, পরিচ্ছেদ : মা যাআ আন রাহমাতি আল-সিবয়ান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯১৯, পৃ. ৭২৩; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৯১৯

পরিবারে অসুস্থ, বিকলাঙ্গরা পরিবারে যতটুকু প্রীতি-স্নেহ পেয়ে থাকে অন্যত্র তা পায় না। এমনকি পরিবারের বাইরের অন্যান্য দরিদ্র-বঞ্চিতরাও পরিবারে উত্তমভাবে স্নেহাশ্রিত হয়। বস্তুত পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে-ভালোবাসা, আন্তরিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহ ভাগাভাগি করা। আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।[৯৭]

পাঁচ. রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি শরী'আহ্‌র সমর্থন

জগণণের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রপ্রধান কখনো কখনো আইনের কঠোরতা, আবার কখনো কখনো আইন প্রয়োগ স্থগিতকরণের অধিকার রাখেন। ইসলামী শরী'আতে তা 'আস-সিয়াসাহ' নামে পরিচিত। আস-সিয়াসাহ শব্দের অর্থ 'জনগণের কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা।' সিয়াসাত হচ্ছে, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। সর্বোপরি সিয়াসাত হচ্ছে শাসক কর্তৃক জনকল্যাণের নিমিত্ত কোন বিধান প্রবর্তন করা। এর সপক্ষে কোন একক দলিল-প্রমাণ না থাকলেও তা সিয়াসাতের অন্তর্ভুক্ত।[৯৮] সিয়াসাত আল-আদিল বা ন্যায়পরায়ণ সিয়াসাত প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শারী'আতে ওয়াজিব। কখনও কখনও এ শাসননীতি কঠোর শাস্তি দান, আবার কখনও কখনও শাস্তি মুলতবী বা লঘুকরণ করা হয়ে থাকে। তবে উভয় অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার ভিত্তি অপরাধের মূলোৎপাটন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[৯৯]

ক. রাষ্ট্র-নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ: শিশু পাচার একটি সন্ত্রাসমূলক কাজ, যা মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধ। এটি হত্যার নামান্তর। এটি জাতীয় জীবনে ফাসাদ ও বিপর্যয়ের

৯৭. আল-কুরআন, ৩০ : ২১

৯৮. আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খৃ. , পৃ. ৩০-৪০

৯৯. মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদুল আযীয আদ-দামিশ্‌কী আল-হানাফী (ইব্‌ন 'আবেদীন), *রাদ্দু আল-মুহতার 'আলা আদ্‌-দুররি আল-মুখ্‌তার*, বৈরূত : দারু আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি., খ. ৩, পৃ. ২০৩-২০৪

সৃষ্টি করে। আর ইসলাম এ জাতীয় অপরাধের জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের শাস্তি বর্ণনা করেছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সঙ্গে লড়াই করে এবং জমিনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা। এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।[১০০]

খ. সুবিচার প্রাপ্তির নিরাপত্তা বিধান : ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সবাই যেন সুবিচার পায় একজন ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলকেই তা নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

হে ঈমাদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।[১০১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করো তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[১০২]

১০০. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩
১০১. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫
১০২. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

ইসলামের আইন রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, শক্তিমান-দুর্বল, অভিজাত ও সাধারণ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং পারিবারিক স্নেহ-মমতা, রাষ্ট্র নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ এবং সুবিচার প্রাপ্তির নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা মানব পাচাররোধক সূচক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

মানব পাচার নিরোধক আইন ও ইসলামী দৃষ্টিকোণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে আইনটি পাশ করা হয়। এটি ২০১২ সালের ৩ নং আইন। এ আইন অনুসারে মানব পাচারকারী ব্যক্তি এ অপরাধের জন্য অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ লাখ টাকা অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ কাজে প্ররোচনাদানকারী বা সহযোগী অনধিক ৭ বছর অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মানব পাচারের উদ্দেশ্যে কাউকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করে রাখলে অনধিক ১০ বছর অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। পতিতাবৃত্তির জন্য কাউকে **স্থা**নান্তর বা আমদানী করলে এ আইন অনুসারে অপরাধী অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মুখের ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি বা অশালীন ভাব-ভঙ্গি করে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালে তিনি অনধিক ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে যে কোন জেলায় মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল গঠন করবে। ট্রাইবুনাল ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাবে। সবশেষে মানব পাচার আইনের সপ্তম অধ্যায়ের বিধিতে মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে মর্যাদা দান করেছে। সে সাথে জীবন, সম্পদ ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন দণ্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনহানী, অঙ্গহানী, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা এবং শিশুশ্রম ও দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্র ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা বা প্রয়োগ করে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অশ্লীলতা প্রতিরোধ

করতে পারে। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা একে অপরের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে (যা উপরে আলোচিত হয়েছে)। মানব পাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের সরাসরি বিধান না থাকলেও মানব পাচারের যে উদ্দেশ্য যেমন, অবৈধ ব্যবসা, জীবননাশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি, শিশুশ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও নীতিমালা, যার প্রয়োগ এবং প্রতিপালনে মানব পাচারের মত অপরাধ দমন হবে।

অতএব, বাংলাদেশে প্রচলিত মানব পাচার আইন ও ইসলামের শিক্ষার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, মানব পাচার ও অপরাধ দমনে ইসলামী আইন, শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিকল্প নেই। কেননা ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে অন্যায়-অবিচার থেকে বিরত রাখে। যার মনে আল্লাহ ও আখেরাতের বিন্দুমাত্র ভয় আছে সে কখনও এ ধরনের গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে না। খোদাভীতি ও শেষ বিচারের ভয় মানুষকে যেভাবে তাড়িত করতে পারে সেভাবে কোন আইন মানুষকে তাড়িত করতে পারে না। অপরাধের সকল দুয়ার উন্মুক্ত রেখে শুধু আইন করে অপরাধ রোধ করা যায় না। মানব পাচার রোধে ব্যক্তির মননে ধর্মীয় মূল্যবোধ অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

বাংলাদেশে মানব পাচার নির্মূলে সুপারিশমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মানব পাচারের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী ও শিশু পাচার রোধে বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন, পুলিশ সদর দপ্তরে মনিটরিং সেল স্থাপন, স্থল ও বিমান বন্দরে বিশেষ তল্লাশি ব্যবস্থা, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন এবং উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মসূচি নেয়া হয়েছে । তবুও এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে:

এক. মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রণীত আইনটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা।

দুই. মানুষের মধ্যে পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব । তবে আইনের চেয়ে সবার মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি নারী ও শিশু পাচার রোধে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিন. সীমান্তবর্তী এলাকায় শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে জনগণ, স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় আলোচনা সভার ফুটেজ তৈরি করে তা প্রচার করা যায় । এ ছাড়াও পথনাটক, ছবি প্রদর্শন, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ও বিলবোর্ড স্থাপন করে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম চালানো যায়।

চার. সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, বই-পুস্তক, চলচ্চিত্র, মুদ্রিত সামগ্রী নানাভাবে নারী ও শিশু পাচারের ওপর জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও বাণী নিয়মিতভাবে প্রচার করতে পারে।

পাঁচ. পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় গ্রাম, পাড়া বা মহল্লায় কোন অপরিচিত লোক দেখলে তার সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদার অথবা থানায় অবহিত করার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। যেসব সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা প্রতিরোধে কাজ করে তাদের সঠিক তথ্য দেয়া ও সহায়তা করাও কর্তব্য।

ছয়. বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রের পরিচয় জানা এবং মেয়ের অভিভাবকের ছেলের পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া প্রয়োজন। পাচারের পরিণতি সম্পর্কে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পরিবারের সবাইকে সচেতন করা কর্তব্য। কাজের লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ছবি তুলে রাখা এবং প্রাক-পরিচয় যাচাই করে নেয়া আবশ্যক ।

সাত. বাড়ির শিশুকে নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার মুখস্থ করানো এবং অপরিচিত লোকের দেয়া কোন খাবার বা জিনিস যাতে গ্রহণ না করে সে বিষয়ে পরিবার থেকেই শিশুকে সচেতন করতে হবে ।

আট. স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদের ইমামগণও এ ক্ষেত্রে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে পারেন।

নয়. বাংলাদেশে মানব পাচারের কারণসমূহ দূরীকরণের লক্ষে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিশেষ করে দরিদ্রতা হ্রাস, অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো অতীব প্রয়োজন।

দশ. বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেহেতু মুসলিম তাই সচেতনতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে নাগরিকদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যবস্থা নেয়া অতিব সঙ্গত। সে লক্ষ্যে মানব পাচার রোধকল্পে জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের কঠোর ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এগার. মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসসমৃদ্ধ বক্তৃতা, লেখা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। সে সাথে জনগণকে শরী'আহ আইন পরিপালনে উদ্বুদ্ধ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

উপসংহার

মানব পাচার মানবাধিকারের একটি চরম লঙ্ঘন এবং সভ্যতার প্রতি উপহাস, যা সমাজে দরিদ্রতা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ইসলামী শিক্ষার অভাব, বিপুল জনসংখ্যা, আবাসন স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে ঘটে থাকে। বাংলাদেশে এটি আজ জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর জন্য রয়েছে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও জেলা কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা। এতদসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, মানব পাচার দিন দিন বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। মানব পাচার প্রতিরোধে ইসলামের রয়েছে যথার্থ শিক্ষা দর্শন ও দিকনির্দেশনা। ইসলাম মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের আইন-কানূন মেনে চলার প্রতি কঠোর নির্দেশনা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। এজন্য ইসলামের নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সাধারণ জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী, পেশাজীবী, গণমাধ্যমকর্মী, ব্যবসায়ীসহ দেশের সকল বিবেকবান মানুষের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।